চারদুয়ার ঃ এক ‘সামাজিক’ মা ও মেয়ের নাটক

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বাঙালি সমাজে সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত মহলে তো নয়ই, উচচবিত্তদের মধ্যেও সম্ভবত নয়। শুধু বাঙালি সমাজই বা বলি কেন, ভারতীয় সমাজেও কি এমন এক মায়ের তথা নারী চরিত্রের দেখা পাওয়া সহজ? এক প্রৌঢ়া তিন কন্যার জননী, শিক্ষিকা অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা আজকের এই ‘মা’একদিন এক বিবাহিত সংসারি পুষকে ভালবেসেছিলেন। এক বিবাহিত উভয় পুষ বা নারীই বিবাহিত এবং সংসারধর্মে নিরত হয়েও অপর কোনও বিবাহিত পুষ বা বিবাহিত নারীর প্রতি অনুরক্ত — ভাল বললে বিবাহিত বা সংসারি কি না এই শর্ত উপেক্ষা করে পরস্পরের প্রতি একরকম মানসিক টান অনুভব করেন আর সংযোগ বা সখ্যতা বজায় রেখে চলেন — নারী পুষের এ জাতীয় সম্পর্কে সমাজ-সংসার ভাল চোখে না দেখলেও, অনুমোদন না করলেও — এমনতর প্রেমের সম্পর্ক যে কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া নয় বরং সমাজের মধ্যেই বহমান রয়েছে — প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি তার দৃষ্টান্ত কম নয়। রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক এ জাতের ‘অসামাজিক’ ছন্নছাড়া ভালবাসার পরমতম উদাহরণ।

কিন্তু শুধু ভালবেসেই ক্ষান্ত হননি, দুর্জয় সাহসের অধিকারিণী এক নারী সেই পুষটির সন্তান ধারণ করেছেন তিন তিনবার। তাঁর প্রেমিকপ্রবর সমাজের কোনও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে চলেছেন। অন্যদিকে এই দুঃসাহসিনী নারী সমাজ বা আইনসম্মতভাবে কার স্ত্রী না হয়েও অন্যত্র একাকী তিনটি কন্যাকে পালন পোষণের একক দায়িত্ব নিয়ে বড় করে তুলেছেন। দু’মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছোটটি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

এমন এক ‘অসামাজিক’, ‘অবিবাহিত’ মা আর তাঁর তিন কন্যার জীবনের জটিলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে গান্ধারের নতুননাট্য ‘চারদুয়ার’। প্রশান্ত দলভির মারাঠি নাটকের রূপান্তর। নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। জীবনের জটিলতা তো বটেই — জটিলতা বাদ দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন হয় না, জটিলতা এড়িয়ে মানুষের জীবন গভীরতা লাভ করে না — কিন্তু এই চারজনের জীবনকে ছেয়ে আছে অস্বাভাবিকতা। মা ও তাঁর তিন মেয়ের জীবন অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, বিপর্যস্ত হয়। এ নাটকের চারটি নারীর জীবনস্রোত ক্রমশ সংকটপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। মা তো বহুকাল আগেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন অপ্রচলিত জীবনধারা। বিবাহিতা বড় মেয়ের জীবনেও সংকট ঘনিয়ে তুলেছে তার লম্পট স্বামী। অন্য নারীতে স্বামীর আসক্তি আর তা প্রদর্শনের নির্লজ্জতায় অতিষ্ঠ হয়ে বড় মেয়ে বিদ্যা তার শিশুকন্যাকে বাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে মায়ের কাছে। সে সমাজবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্রী এবং অধ্যাপিকা — সে তার সাংবাদিক স্বামীকে বিদ্যাবুদ্ধি অনুভবশক্তিতে হীন বলে মনে করে। তার ওপর যুক্ত হয়েছে অবিশ্বস্ততা, অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি মারার নীচতা — তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। মাও মেয়েকে সমর্থন করেন। আর সমাধানের রাস্তা না বেরন পর্যন্ত তাঁর কাছেই মেয়েকে রেখে দেন। বিদ্যার জীবনের সংকট এ-নাটকের একটা প্রধান অংশ। এবং এতে নাট্যে বেগ সঞ্চার হয় আর তীব্রতা বাড়ে। মা-মেয়ে এই সংকট কীভাবে মোকাবিলা করে দেখার জন্য দর্শকের কৌতুহল বেড়ে যায়। কৌতুহল বাড়ে, কারণ মেয়ে জামাইয়ের চরিত্র নিয়ে কটুমন্তব্য করলে জামাইবাবাজিও শাশুড়ির জীবনের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বহু বছর বাদে মাকে এই সূত্রে তাঁর অবিবাহিত জীবন এবং বিবাহিত-সংসারি পুষের সন্তানধারণের প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে

হয়।

তারপর নাটকে প্রবেশ করে মেজ মেয়ে বৈজয়ন্তী। মায়ের কাছে একটি মেয়ের প্রবেশ মানে যেন একটি সমস্যার প্রবেশ। আপাত হাসিখুশির আড়ালে সে যে এক অসুখী জীবনযাপন করে চলেছে ধীরে ধীরে তা উন্মোচিত হয়। মেজ মেয়েও তার স্বামীকে নিয়ে সুখী নয়। তার স্বামীটি অবশ্য বড় মেয়ের স্বামীর মতো তেমন বিপজ্জনক কিছু নয় — তেমন বিপত্তির কোনও কারণ নয় কিন্তু এক প্রাণবন্ত উচ্চাভিলাষী তণী স্ত্রীর জীবনে অন্ধকারের ছায়া নামিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। আসলে তার স্বামী শ্রীকান্ত একটি মাকাল ফল মাত্র। দেখতে সুন্দর, ফিটফাট থাকায় সদা ব্যস্ত, স্মার্ট দেখাবার আর কথা বলার চেষ্টা করে পেরে ওঠে না, ফেসে যায়, বোকামি করে ফেলে, স্থায়ী চাকরি বজায় রাখতে পারে না, আজকালকার কঠিন দিনে নির্দিষ্ট সম্মানজনক আয়ের সুবন্দোবস্ত করতে অপারগ, চাকরি জুটিয়ে দিলে সামান্য অজুহাতে ছেড়ে পালিয়ে আসে। যুবকটির এমন কতশত দোষ। এক কথায় আজকের সমাজে অচল, জটিল জীবনধারায় একদম বেমানান। তার ওপর আবার কিছুদিন খুব ঝোলাঝুলি করছে যে সে বাবা হতে চায়। বৈজয়ন্তীকে মা হবার জন্য সাধাসাধি করে। কিন্তু বৈজয়ন্তী সাহস পায় না। স্বামীর অভিলাষ আর রেস্তের দোর নিয়ে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এই সরলমনা, সংসারের অনুপযুক্ত স্বামীকে নিয়ে সে কী করবে — কী করে বাকি জীবন কাটাবে? এই আফশোস থেকে সে এক সময় পরিত্রাণ পায় যখন জানতে পারে তার বড়দির স্বামীর কীর্তি — স্বামীর ভ্রষ্টাচারের জন্য বিদ্যার জীবন ছারখার হতে বসেছে — সে উপলব্ধি করে যে শ্রীকান্ত আর যাই হোক — কোনও তণীর স্বপ্নে দেখা আদর্শ স্বামী হতে না পাক, সে কিন্তু তার স্ত্রীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সবচেয়ে বড় কথা সে তার তণী বউয়ের প্রতি অনুগত, অনুরক্ত, সে তার জীবনে বউকে গুত্ব দেয়, তাকে খুশি করার চেষ্টা করে নিজের মতো করে, তার বউয়ের কাছে শীঘ্র মধ্যে সন্তান চায়, সন্তান চায় না কিংবা তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এত জটিল পরিকল্পনা সাজানের কথা ঠাঁই পায় না — সে বাবা হবে, বিজু মা হবে, তারা সন্তান মানুষ করবে এমনটা তার কাছে বড় কথা।

শ্রীকান্তকে নিয়ে নাটকের মধ্যে এক সময় সংকট ঘনিয়ে উঠে ছিল। সে যেন কখনো শুধরোবে না, একজন উপযুক্ত চৌকস স্বামী হয়ে উঠবে না। মায়ের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে যায়। কিন্তু বৈজয়ন্তীর উপলব্ধির পর তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং এই নাটকও নতুন মাত্রা পায়।

ছোট মেয়ে বিনিকে নিয়েও মায়ের এবং দিদিদের সমস্যা কম নয়। তার দুই সহপাঠী বন্ধু প্রকাশ আর বীরেন্দ্রর মধ্যে কাকে ও ভালবাসে, কাকে ও বিয়ে করবে, কার সঙ্গে সংসার জীবন কাটাতে চায় তা ঠিক করতে পারে না কিছুতেই। মা আর দু'দিদি ওকে চেপে ধরে — দু'জনের মধ্যে আর বিলম্ব না করে একজনকে বেছে নিতে বলে — বিয়ের জন্য আর দেরি করা চলে না। এদিকে দু'জনেই উপযুক্ত যুবা, দু'জনেই সুপাত্র, দু'জনেই ওকে গভীরভাবে ভালবাসে; দু'জনেই ওকে বলে তাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার জন্য মনস্থির করতে; বিনির সিদ্ধান্তই ওরা মেনে নেবে কিন্তু একজনকে এবার বেছে নিতেই হবে — তাদেরও এই চূড়ান্ত কথা। আসলে, দু'জনের মধ্যে থেকে কিংবা দশজনের মধ্যে থেকে একজনকে জীবনের জন্য বেছে নেওয়া বা বিয়ে করা— এটা হল একজন যুবকযুবতীর কাছে সমাজের দাবি।

শৈশব-কৈশোর থেকে সমাজ তার সদস্যের মনটিকে এ ভাবেই গড়ে তোলে। ছাঁচে ঢালে। সমাজ এবং আইন-নির্দিষ্ট বিবাহের নিয়মটাই এ রকম। ভালবাসার নিয়ম, বিবাহের নিয়ম তথা সমাজের প্রচলিত অনুশাসন এ রকমই দাবি করে — একজন আর একজনকে বেছে নেবে কিংবা অভিভাবকরা বেছে দেবে এবং তারপর তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ অর্থাৎ জীবনভর সুখে কালাতিপাত করবে। একজন একই সঙ্গে, একই সময়ে দুজনকে বেছে নিতে পারবে না। কিংবা দু'জন একজনকে বেছে নিতে পারবে না। তাহলেই বিপত্তি। বিনিকে একসময় দেখেছি টোমাস মানের কাহিনী অবলম্বনে গিরিশ কারনাডের বিখ্যাত নাটক 'হয়বদন' নিয়ে প্রকাশের সঙ্গে আলোচনা করতে, তর্ক করতে। সেখানে এক নারী চেয়েছিল এমন এক পুষকে যার মধ্যে উন্নত মস্তিষ্ক এবং সুঠাম-আকর্ষণীয় শরীরের সমন্বয় ঘটবে। একই সঙ্গে

দু'টো প্রত্যাশার মিলন। নাটকের অন্তিমে জানা যায় বিনি কিন্তু একই পুষের মধ্যে উন্নত মস্তিষ্ক মেধা বা হৃদয়বৃত্ত এবং শারীরিক সৌন্দর্যের সমন্বয় চায় না। সে কোনও জোড়া দেওয়া 'হয়বদন' চায় না। তার একই জীবনে সে দু'টি ভিন্ন স্বভাবের-প্রকৃতির পুষকে চায় একই সঙ্গে একই কালে। দু'টি সম্পূর্ণ পুষকে নিয়েই সে জীবনযাপন করবে বলে স্পষ্টভাষায় সবাইকে জানিয়ে দেয়। বিনি একই সঙ্গে প্রকাশ ও বীরেন্দ্রকে বিয়ে করতে চায়। সে জীবনে কাকেই ছেড়ে থাকতে চায় না, কাউকে বাদ দিয়েই সে সুখী হতে পারবে না। তার এ সিদ্ধান্তের অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গিতে, অন্তর্নিহিত সারল্যে এ-জগৎ হকচকিয়ে যেতে পারে, সমাজ ঝনঝন করে উঠতে পারে, কিংবা অসার কল্পনায় মুচকি হাসতে পারে — কিন্তু বিনির কিছু আসে যায় না। সে বেশ ভেবেচিন্তেই, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তার অনড় অভিমত প্রকাশ করে দিয়েছে। এবং তার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করে দিয়ে সে ভারমুক্ত।

সমাজহিতৈষী পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক মানুষরা বলবেন বিনি তার এই অল্প বয়সে এ সিদ্ধান্তের বাস্তবপরিণাম সম্বন্ধে তো কিছুই জানে না। এ তো অল্পবুদ্ধি খেয়ালি তণীর অলীক কল্পনা বই কিছু নয়। সে আর জীবনের কী জানে। কতটুকু দেখেছে! তার উচ্চারণের আন্তরিকতা আর দৃঢ়তা থেকে কিন্তু দর্শকের মনে না হয়ে পারে না যে বিনি এত হালকা করে কথাটা বলেনি। সে অন্যরকম ভাবে জীবনটাকে তথা 'বিবাহ'-ব্যাপারটাকে দেখতে চায় — পুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ককে-সংযোগকে নতুন করে ভাবতে পেরেছে সে। একজন পুষের সঙ্গে একজন নারীর বন্ধনের গণ্ডিটাকে সে আরও প্রসারিত করে দেখতে চায়। বলতে ইচ্ছে করে এমন মায়ের মেয়েই তো এমন করে ভাবতে পারে, বলতে পারে, চাইতে পারে।

সম্ভব কি না? বাঞ্ছনীয় কি না?

বিনি তার উত্তর জানে না। তার প্রথাভাঙা দুঃসাহসিনী মাও জানেন না। নাট্যকারও জানেন না। এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ তুলে তিনি নাটকের শেষে দুয়ার খুলে দিয়েছেন।

মায়ের জীবনের ইতিহাস এবং ছোটমেয়ের জীবনের চাওয়া ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেক্ষিতে কতদূর বাস্তবসম্মত না কি কেবলই নাট্যকারের কল্পনা — তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কেউ হয়ত বলতে পারেন এমন নাটক অভিনয় করার যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কি? এ নাটক সমাজের কোন কাজে লাগবে? কিন্তু 'চারদুয়ার' নাটকে তিনি নারী পুষের প্রেম এবং বিবাহসংক্রান্ত কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। সমাজের সরাসরি কাজে না লাগলেও প্রশ্নগুলো মানুষের কাজে লাগবে। আর, সমাজের প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে হবে, শিল্পরচনার এমন কোনও শর্ত আছে কি? জীবনের কোনও দিক নিয়ে ভাবানোর দায়িত্ব পালনে আরও বহুবিধ জ্বলন্ত সমস্যায় কন্টকিত সম্প্রতিকালের ভারতীয় সমাজের একটি সামান্য অংশই এ ভাবনার অংশীদার হতে সক্ষম। মেঘনাদ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় বিজয়লক্ষ্মী বর্মন (মা), মানসী সিনহা (বড় মেয়ে), মেঘনা লাহিড়ী (মেজ মেয়ে), মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট মেয়ে), সৌমেন মুখোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত), পার্থ মুখোপাধ্যায় (প্রকাশ) এবং অর্পণ শর্মা (বীরেন্দ্র)-এর অভিনয়ে 'চায়দুয়ার' একটি মনোযোগ দিয়ে দেখার মতো নাট্যকর্ম হয়ে উঠেছে। বিজয়লক্ষ্মী মায়ের চরিত্রে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন। স্বাধীন চিন্তা-বুদ্ধির অধিকারিণী এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ভূমিকা তাঁর হাঁটাচলা, তাকানো, দাঁড়ানো, কথাবলার ভঙ্গিমায় মঞ্চে জীবন্ত হয়েছে। তিনি যে জীবনে অনেক জটিলতা পেরিয়ে এসেছেন, বহু কিছু সহ্য করেও আজ সসম্মানে সমাজে বাস করেছেন, তিনি যে 'অবিবাহিত' এ-কথা মনে রেখেও সমাজে নিজের স্থানটিকে হীন মনে করেন না — মায়ের চরিত্রের এ রকম অসাধারণত্ব তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে। 'ফুটে উঠেছে' কথাটি বহুব্যবহৃত হলেও সেটিই প্রয়োগ করলাম।

পর্দা সরতেই মঞ্চ জুড়ে মায়ের বাড়ির বিশাল সেট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিকল্পনা করেছেন দেবাশিস মজুমদার। বাবা আর জ্যেষ্ঠ জামাতাকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায় না। বাকিদের সংলাপে তাঁদের সম্বন্ধে জানা যায় কিন্তু দু'বার তাঁদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার সময় তীব্র নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি হয় এবং অদৃশ্য পুষ দু'টির চরিত্র বেরিয়ে আসে। আমাদের

সমাজগঠনে পুষতান্ত্রিক ধরনটি স্পষ্ট হয় এইভাবে। কিন্তু বোঝা মুশকিল হয়ে ওঠে এ রকম একজন ভী পুষের সঙ্গে 'মা' কেন বা কী উদ্দেশ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। ছোট মেয়ের জন্মদিনে কথা দিয়েও যিনি আসতে পারেন না, সবাই যখন তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে তখন ফোনে জানিয়ে দেন তাঁর অপারগতা এইরকম একটি ভদ্র গৃহস্থ সামাজিক পুষের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্কের ধরনটি এ নাটকে আরও কিছুটা উঠে এলে মায়ের চরিত্রটি আরও ব্যাপকতা পেত বলে মনে হয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com